

উৎসর্গ

আমার মা শ্রীমতি মিরাদেবনাথ
বাবা জনাব সুধাংশু দেবনাথ

যাদের আশীর্বাদ আর স্নেহস্পর্শ
এই সুদূর এথেন্সে আমার দুঃখ রাতের প্রবতারা

পূর্বকথা

আমি মনে করি মানুষ গল্পজীবী প্রাণী। মানুষের জীবন একটি গল্প। মানুষ প্রতি মুহূর্তে গল্প বানায়। প্রয়োজনে বানায়, এমনি এমনি ও বানায়। মানুষ গল্প শুনতেও ভালোবাসে। মানুষ গল্পভুক। মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি যে মানুষ কোনো বিষয়ের শুধু গল্পটুকু মনে রাখে। বাকি সবকিছু ভুলে যায়। আমাদের জীবনের প্রথম দিন থেকে যা কিছু ঘটেছে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলোকে আমরা কোনো না কোনোভাবে গল্প বানিয়ে ফেলতে পেরেছি, শুধু সেগুলোই আমাদের মনে আছে।

সেজন্য আমি যা কিছু বলি, গল্পের মতো বলি। যা কিছু লিখি, গল্পের মতো লিখি। আমি নিজে একটি গল্পজীবী প্রাণী— এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেজন্য গল্পেই নিয়ে এসেছি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল একটি সময়কে। সেই সময় যখন ইউরোপের সভ্যতা ছিল আঁতুড়ঘরে। আঁতুড়ঘরের নাম এথেন্স। এথেন্স শহরে মাত্র দুটি প্রজন্ম জন্ম নিয়েছিল বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণতন্ত্র, সাহিত্যের ট্র্যাজেডি ও কমেডি, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্য, নৈতিকতাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখা। সেই জন্মের গল্পই ‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। যে বই হাতে নিই, একটি জিনিস কমন। বইটিতে যদি জ্ঞানের কোনো কথা থাকে, তবে সেই জ্ঞানের জন্ম হয়েছে গ্রিসে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেকোনো শাখার ব্যাপারে একটি কথা নিশ্চিত, সেই শাখার জনক গ্রিসের কোনো এক মানুষ। ভাবতাম— গ্রিসের মানুষের কি অন্য কোনো কাজ নেই, শুধু একটির পর একটি বিদ্যার জন্ম দিয়েছে?

ঘটনা আসলেই তাই। সেই সময় সত্যিই গ্রিসের কিছু মানুষের কোনো কাজ ছিল না। সব কাজ করত দাসেরা। ধনীদেব ছিল অফুরন্ত সময়। মানুষের স্বভাব হলো— কাজ না থাকলে, মানুষ আমোদ-ফুর্তি করে, বিলাসে গা ভাসায়। কিন্তু গ্রিকরা তাদের অফুরন্ত সময় ভোগ-বিলাসে নষ্ট করেননি। অনেকেই শুধু জ্ঞানচর্চা করেছেন। সেই চর্চার ফলে জন্ম নিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। সময়টি ছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতক। ঐ সময় এথেন্স এবং আশেপাশের কয়টি শহরে জন্ম নেয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা। একটি সময়ে একটি শহরে বুদ্ধিবৃত্তির ঐ রকম সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে আর হয়নি।

সেই সময়ের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আমি চাকরি করতে এলাম এথেন্সে। মাত্র এয়ারপোর্টে নেমেছি। আমার স্ত্রী নিবেদিতা বলল, ‘আচ্ছা, এখানে হেমলক কোথায় খায়?’ প্রশ্ন শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হেমলকের মতো মারাত্মক বিষ খেতে হবে নাকি! ভয়ে ভয়ে নানান প্রশ্ন করে বুঝলাম, ‘হেমলক কোথায় খায়’ মানে হলো— সক্রোটিস কোন জায়গায় হেমলক পান করেছিলেন? তো খুঁজতে শুরু করলাম— সক্রোটিসের হেমলক পানের জায়গাটি। সেই খোঁজ থেকেই এই বইয়ের শুরু।

আমার অনুসন্ধান ছিল মোটামুটি তিনভাবে। সেই সময়টিকে পড়ে ফেলা, তারপর নিজের চোখে ঘটনার জায়গাগুলো দেখা, এরপর জটিলতা থাকলে কোনো গ্রিক বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলা। এই অনুসন্ধান থেকেই ‘হেমলকের নিমন্ত্রণ’। গল্পের পটভূমি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক। বছর হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ থেকে ৩৯৯ অব্দ পর্যন্ত। গণতন্ত্রের জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫০৮ অব্দে আর সক্রোটিসের মৃত্যু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতককে পণ্ডিতগণ বলেন গ্রিসের ক্লাসিক্যাল সময়। আমি ঐ সময়টাকে ধরতে চেয়েছি।

অনুভব করতে চেয়েছি— সক্রোটিস কীভাবে এথেন্সের আগোরার পথে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কঠিন দর্শনের কথা সহজ করে বলতেন। কারা কোন আদালতে ঠিক কীভাবে বিচারের নামে হত্যা করল সক্রোটিসকে। হেরোডোটাস কোথায় বসে কোন অবস্থায় লিখতে শুরু করলেন পৃথিবীর প্রথম ‘ইতিহাস’। গণতন্ত্রের মতো একটি অভিনব ব্যবস্থা কোন মানুষগুলো কীভাবে আবিষ্কার করল। চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস ঠিক কোন সময় ডাক্তারদের জন্য লিখলেন তাঁর চমৎকার ‘হিপোক্রেটিক শপথ’।

পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যের কাঠামো গ্রিক ট্র্যাজেডি আর কমেডি। এই গল্পে আমি দেখতে চেয়েছি সেই থিয়েটার, যেখানে গ্রিক ট্র্যাজেডি জন্ম নিয়েছিল। কথা বলতে চেয়েছি পৃথিবীর প্রথম অভিনয়শিল্পীদের সাথে। ঢুকতে চেয়েছি হোমারের অন্ধ কুঠুরিতে, সফোক্লিসের নাটক লেখার মনে, ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডির গুহায়। আমি তাদের লেখাকে তাদের মতো করে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭২ অব্দে ইউরোপের প্রথম ট্র্যাজেডি লেখেন এফ্কিলাস। ট্র্যাজেডির নাম ‘Persia বা পারস্য’। মানুষ যত সুখেই থাকুক না কেন, মানুষের অন্তরে চিরকালের একটি দুঃখ-কোঠা আছে, মানুষ নিজের অজান্তেই নিজের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়। তাই বেদনার সাহিত্যই মানুষের মনে গভীরভাবে থেকে যায়। সেজন্য আজ পর্যন্ত পৃথিবীর

কালজয়ী সাহিত্যের প্রায় সবই আসলে ট্রাজেডি। সেই ট্রাজেডি কীভাবে লেখা শুরু করলেন এঙ্কিলাস, কী ছিল তার প্রেক্ষাপট, সেগুলোই গল্পের মধ্যে নিয়ে এসেছি।

এরিস্টটলের মতে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি সফোক্লিসের ‘রাজা ইদিপাস’। রাজা ইদিপাসের কাহিনি পড়েছে আর ধাক্কা লাগেনি, এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। আমি মানতেই পারতাম না— নিজের মাকে বিয়ে করে ফেলার মতো নির্মম আর ভয়াবহ কাহিনি সফোক্লিসের মতো একজন বিশাল লেখক কেন লিখলেন! সেই প্রশ্নটি আমার একেবারে ছোট্টকালের। এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেউ দিতে পারেনি এই গল্পে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। আমি দেখতে চেয়েছি, ঠিক কখন সফোক্লিস উচ্চারণ করলেন, ‘আমি পৃথিবীতে এসেছি শুধুই ভালোবাসার জন্য, কখনই ঘৃণা করার জন্য নয়।’

প্লেটো ছিলেন একজন কবি। সক্রেটিসের ছোঁয়ায় সেই কবি প্লেটো কবিতা ছুড়ে ফেলে হয়ে গেলেন কঠিন নির্দয় দার্শনিক। তার কল্পনার ‘আদর্শ রাষ্ট্র’ থেকে কবি-সাহিত্যিকদের দিলেন নির্বাসন। প্লেটোর কবি থেকে দার্শনিকে বিবর্তন পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছে। প্লেটো দর্শন না লিখলে পৃথিবীই হতো অন্যরকম। প্লেটোর এই পরিবর্তনকে আমি খুঁজতে চেয়েছি।

ইউরোপে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বদলে যাওয়া দেখতে চেয়েছি। কীভাবে মিশরের অনুভূতিহীন ভাস্কর্য বদলে গিয়ে মানুষের মতো হলো, ঠিক কখন পাথরগুলো হাত-পা বাঁকা করে আড়চোখে তাকাতে শুরু করল, সেটি খুঁজতে চেয়েছি।

ঐ সময় এক বাঁক মনীষী মেতে উঠেছিলেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। আমি সেই উল্লাসটাকে একটি গল্পে ধরতে চেয়েছি। সৃষ্টিশীল মানুষের জীবন এবং সৃষ্টিকে একটি মাত্র কাহিনিতে আনতে চেয়েছি। তাতে আমি আশ্রয় করেছি সক্রেটিসের ওপর। সক্রেটিসই এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

এই উপন্যাসের কোনো চরিত্রই কাল্পনিক নয়। অন্যান্য চরিত্র হচ্ছে : দার্শনিক প্লেটো; ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস; ট্রাজেডি নাটকের তিন পিতা— সফোক্লিস, ইউরিপিডিস ও এঙ্কিলাস; কমেডি নাটকের জনক এরিস্টোফানিস; চিকিৎশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস; এথেন্সের গণতন্ত্র ও জ্ঞানচর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক পেরিক্লিস; নারী দার্শনিক আসপাশিয়া; স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রধান শিল্পী ফিডিয়াস; সক্রেটিসের স্ত্রী জেনথিপি এবং তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু দার্শনিক ক্রিতো, চেরোফোন এবং সিমন। এছাড়া গল্পের ছায়ায় আছেন দার্শনিক পিথাগোরাস, বিজ্ঞানের জনক থেলিস এবং নগর পরিকল্পনা শাস্ত্রের জনক হিপোডেমাস।

গল্পের কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ যেহেতু সফ্ৰেটিস, তাকে নিয়ে লেখাৰ উৎস বলা প্ৰয়োজন। সফ্ৰেটিস নিজে তাৰ জীৱনে একটি অক্ষৰও লিখেননি। সফ্ৰেটিস বিষয়ে প্ৰধান ৱেফাৰেন্স অবশ্যই প্লেটোৰ ৱচনাবলি। প্লেটো ছাড়া সফ্ৰেটিসকে দেখেছেন এবং তাকে নিয়ে লিখেছেন এমন মানুষ আছেন দুজন। তাৰা হলেন— সফ্ৰেটিসেৰ ছাত্ৰ জেনোফোন এবং নাট্যকাৰ এৰিষ্টোফানিস। এই তিনজনেৰ লেখায় সফ্ৰেটিস তিন ৱকম। প্লেটোৰ সফ্ৰেটিস অসাধাৰণ এক বিপ্লৱী। তিনি যুগেৰ চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে থাকা একজন মানুষ। আৰ জেনোফোনেৰ সফ্ৰেটিস খুবই সাধাৰণ, তিনি কাৰও সাতে-পাঁচে নেই। উল্টোদিকে এৰিষ্টোফানিসেৰ সফ্ৰেটিস ভয়াবহ জঘন্য একজন মানুষ, তিনি দোকান দিয়ে চিন্তা বিক্ৰি কৰেন, তৰুণদেৰ ভয়াংকৰ ৱকম কুপথে নিয়ে যান। তাই এদেৰ লেখা থেকে কে যে প্ৰকৃত সফ্ৰেটিস, তা কেউ জানে না। প্লেটোৰ অসাধাৰণ গদ্য আৰ তীক্ষ্ণ যুক্তিৰ কাৰণে আমৰা তাৰ ৱচনাৰ সফ্ৰেটিসকেই প্ৰকৃত সফ্ৰেটিস হিসেবে ধৰে নিই। কিন্তু সমস্যা হলো— প্লেটো পৃথিবীৰ সৰ্বকালেৰ সেৱা সাহিত্যিকদেৰ একজন। তিনি দৰ্শন লিখেছেন সাহিত্যেৰ মতো সংলাপ দিয়ে। সেই সংলাপেৰ মূল বক্তা সফ্ৰেটিস। পণ্ডিতোৰা মনে কৰেন, প্লেটো তাৰ কিছু বইয়ে সফ্ৰেটিসেৰ প্ৰকৃত জীৱনকথা লিখেছেন আৰ বেশিৰভাগ বইয়ে প্লেটোৰ নিজেৰ ধাৰণা সফ্ৰেটিসেৰ মুখে সংলাপ হিসেবে বসিয়ে দিয়েছেন। তাই প্লেটোৰ লেখাৰ কোনটি সফ্ৰেটিসেৰ কথা আৰ কোনটি প্লেটোৰ নিজেৰ কথা, সেটি প্লেটো ছাড়া অন্য কেউ বলতে পাৰেন না। সেজন্য প্ৰকৃত সফ্ৰেটিসকে কোনোভাবেই নিশ্চিত কৰে জানা সম্ভৱ নয়। সফ্ৰেটিস সব সময়ই একটি ধোঁয়াশা। সফ্ৰেটিসকে নিয়ে এই ধোঁয়াশাকে পণ্ডিতগণ বলেন ‘সফ্ৰেটিস সমস্যা’। এই সমস্যাকে মেনে নিয়েই আমি মানুষ সফ্ৰেটিসকে তুলে ধৰতে চেষ্টা কৰেছি।

প্লেটোৰ ৱচনা ছাড়া হেৰোডোটােৰ ইতিহাস, হোমাৰেৰ ইলিয়াদ ও অডিসি, এৰিষ্টটলেৰ ৱচনা এবং তখনকাৰ নাট্যকাৰদেৰ লেখা নাটকগুলোই সেই সময়কে বোঝাৰ একমাত্ৰ উপায়। এৰপৰে আড়াই হাজাৰ বছৰ ধৰে সেই সময়কে নিয়ে যাৰাই লিখেছেন, লেখকেৰ নিজেৰ কল্পনা মিশে গেছে তাদেৰ লেখায়। সেখান থেকে শুদ্ধ কাহিনি বেৰ কৰা অসম্ভৱ। তাই আমাৰ কাহিনি একশভাগ শুদ্ধ বলে দাবি কৰব না। তবে আমি জেনে বুঝে কোনো ভুল তথ্য দেইনি। আমি কোনো সৃষ্টিশীল মানুষেৰ জীৱনকে বদলে দেইনি। একটিও কাল্পনিক চৰিত্ৰ নেইনি। এৰপৰেও যে ভুল ৱয়ে গেল, তাৰ জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিছি। সফ্ৰেটিসেৰ মুখেৰ কথাটিই বলি— ‘আমি শুধু একটি জিনিসই জানি, সেটি হলো— আমি আসলে কিছুই জানি না।’